

দিন গ্রহে প্রাণ এবং বুদ্ধিমত্তার খোঁজে

(প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে -৬)

ফরিদ আহমেদ

মহাবিশ্বে মহাকাল- মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পূর্ববর্তী পর্বের পর...](#)

ওই যে সুদূর নীহারিকায়

মানব সভ্যতা বিকাশের বহু বহু আগে, সুপ্রাচীন কালে, কোন এক শ্বেতশুভ্র মায়াবী পুর্ণিমা রাতে, হয়তো আমাদেরই কোন এক পূর্বপুরুষ অসীম কৌতুহল নিয়ে মাথা তুলে তাকিয়েছিল সুবিস্তৃত আকাশের অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে। অপরিণত বুদ্ধিমত্তা আর সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিল এই বিশ্বব্রহ্মান্দসহ নিজের উৎপত্তির অপরিসীম রহস্যকে। রহস্যের কূল কিনারা করতে পারুক আর নাই পারুক, দুর্দমনীয় এই কৌতুহলকে আমাদের সেই পূর্বপুরুষ খুব সফলভাবেই ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আদি পুরুষের সেই অনুসন্ধিৎসা উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ এখনো বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আজন্ম তার রক্তের মধ্যে। তাই হয়তো অজানাকে জানা আর রহস্য উন্মোচনে মানুষ দুর্দমনীয়, ক্লান্তিহীন। নাছোড়বান্দার মতো ‘সৃষ্টির’ আদি এবং অন্তকে ছিড়ে খুঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করার অদম্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে নিরন্তর। কোথা থেকে বিশ্বজগতের সূত্রপাত আর কোথাই বা শেষ, কোন অমর্তলোক থেকে যাত্রা আমাদের, কেনই বা আমরা এই পৃথিবীতে, কিই বা এর উদ্দেশ্য এহেন হাজারো কৌতুহল আর উত্তরহীন জিজ্ঞাসা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষ যখনই জেনেছে যে, রাতের আকাশের আলোকরাজী আর কিছুই নয় বরং আমাদের সূর্যের মতোই অগুণতি সূর্যের সমাহার, তখনই সচেতনভাবে মানুষের চিন্তায় এসেছে, অনন্ত অসীম এই মহাবিশ্বে তাহলে কি শুধু আমরাই আছি? নাকি আমাদের দৃষ্টি এবং বোধসীমার বাইরে সুবিস্তৃত বিশ্বজগতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদেরই মতো বা আমাদের চেয়েও উন্নত অসংখ্য সভ্যতা?

মেঘহীন পরিষ্কার আকাশে খালি চোখে আমরা মাত্র কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখতে পাই, যা প্রকৃত সংখ্যার অতি নগন্য অংশ মাত্র। শুধুমাত্র আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথেই নক্ষত্রের

সংখ্যা চারশ বিলিয়নের মতো। হাবল মহাকাশ টেলিস্কোপের মাধ্যমেই পঞ্চাশ থেকে একশ' বিলিয়ন ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। সুবিশাল এই মহাবিশ্বের অনন্ত নক্ষত্রমালার কোন কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকাটা আর যাই হোক না কেন অসম্ভব যে নয় তা যে কোন একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝবে। বিজ্ঞানীদের মতে প্রাণ প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ যা অনুকূল পরিবেশ পেলেই বিকশিত হয়ে উঠে। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, উৎপত্তির পর তুলনামূলকভাবে খুব কম সময়েই পৃথিবীতে 'প্রাণ' তার আগমনী সংগীত গেয়েছে। কাজেই একই ধরনের পরিবেশ পেলে, যে সমস্ত নক্ষত্র আমাদের সূর্যের মতো সেগুলোর গ্রহতেও প্রাণের বিকাশ ঘটা খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়।

পৃথিবী নিঃসন্দেহে প্রাণের এক উর্বর বিচরণভূমি। ফলুধারার মতো বিকশিত হয়েছে প্রাণ এখানে। যে দিকে তাকানো যায় শুধু প্রাণ আর প্রাণ। বিচিত্র সব প্রাণের সমাহারে নন্দিত আমাদের এই বসুন্ধরা। কিন্তু সাড়ে চার বিলিয়ন বছর আগে জন্ম নেওয়া এই ধরনী প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাণের জন্য মোটেই সৌহার্দ্যমূলক ছিলনা। প্রথম এক বিলিয়ন বছর বা তার কিছু সময় পর পৃথিবীতে গলিত প্রস্তর এবং এসিডের মহাসাগরে স্থিতিবস্থা আসে। জীববিজ্ঞানীরা সাড়ে তিন বিলিয়ন বছরের পুরনো স্তরীভূত প্রস্তর উদ্ধার করেছেন যার মধ্যে পাওয়া গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী সায়ানোব্যাকটেরিয়ার (Cyanobacteria) ফসিল (পঞ্চম অধ্যায়, চিত্র ৫.৪ দ্রষ্টব্য)। এই সরল প্রাণের সুদীর্ঘ বয়সই প্রমাণ করে পৃথিবীর উৎপত্তির মাত্র এক বিলিয়ন বছরের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল। এতো সহজেই যদি পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটতে পারে তবে সুবিশাল এবং সুবিস্তৃত মহাবিশ্বের অন্য কোথাও যে এর বিকাশ হয়নি তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়!

চরমজীবীদের রাজত্বে

ষাটের দশকে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী টমাস ব্রক (Thomas Brock) এবং তার সহকর্মীরা ওয়াইওমিং এর ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উষ্ণ প্রস্রবনে এক ধরনের সরলাকৃতির অণুজীব (Microbes) আবিষ্কার করেন। বেশীর ভাগ জটিল কোষী প্রাণীই এই তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে না। যে সমস্ত 'প্রাণ' এই ধরনের ভয়ংকর বৈরি পরিবেশে টিকে থাকতে পারে তাদেরকে বলা হয় চরমজীবী (Extremophile)। পৃথিবীতে বেশ কয়েক ডজন চরমজীবীর অস্তিত্ব রয়েছে। কিছু কিছু চরমজীবী আছে যারা পৃথিবীর যে কোন পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম।

জীববিজ্ঞানীরা এন্টার্কটিকার লেক ভোস্টক এবং সাইবেরিয়ার জমাট বরফের মধ্যেও অণুজীব খুঁজে পেয়েছেন। কিছু অণুজীব আবার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এসিডিক বা বেশি ক্ষারীয় পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। অতিরিক্ত লবনাক্ততা যে কোন প্রাণীর জন্যেই ক্ষতিকর, অথচ কিছু অণুজীব আছে যারা তেল খনির বা লবনের খনির মধ্যেও বসবাস করে। চিলির আটাকামা মরুভূমি যেখানে গত ১০০ বছরেও বৃষ্টি হয়নি সেখানেও বহাল তবিয়েতে বেঁচে বর্তে আছে কিছু কিছু অণুজীব। আমরা যখন এ বইটি লিখছি ঠিক সেসময় ‘ওয়ার্ল্ড সায়েন্স’ (অক্টোবর ১৯, ২০০৬)-এর একটি রিপোর্টে দেখলাম বিজ্ঞানীরা মাটির ২.৮ কিলোমিটার গভীরে সোনার খনিতে একধরনের ‘চরম জীবী’ অণুজীব খুঁজে পেয়েছেন যারা সূর্যের আলোর বদলে ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তাকে শক্তির আধার হিসেবে ব্যবহার করে।

তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চরমজীবী হচ্ছে *নল কৃমি* (Tube worm)। সমুদ্র তলদেশের গভীর ফাটলে বসবাস এদের। পানির ভয়াবহ চাপ, গভীর অন্ধকার, ২৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়েও বেশি তাপমাত্রা এবং ফাটল থেকে নির্গত ভয়ংকর রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করেও এরা টিকে আছে। টিউব ওয়ার্মের ভিতরে একধরনের ব্যাক্টেরিয়া থাকে যাদের নাম *Pyrolobus fumarii*। এরা এই তাপমাত্রায় এমনভাবে অভ্যস্ত যে তাপমাত্রা কিছুটা কমে একশ পচানব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌঁছলেই তারা তাদের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়, এমন একটা ভাব যেন তারা ‘ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে’!

প্রাণের এই ব্যাপক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও জীববিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সকল প্রজাতির প্রাণকে তিনটি এলাকায় (domain) ভাগ করেছেন। সমস্ত বৃহৎ ও জটিলকোষী প্রাণী এবং উদ্ভিদ নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রকৃতকোষী (Eukarya)। যে সকল এককোষী প্রাণ যাদের কোষে কোন নিউক্লিয়াস নেই তাদেরকে নিয়ে ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং নিউক্লিয়াসবিহীন আদিম প্রাণ যাদের কোষের প্রাচীর ব্যাক্টেরিয়ার থেকে ভিন্ন তাদের সমন্বয়ে আদিকোষী (Archaea)। প্রতিটি ভাগের প্রজাতিসমূহ একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তিনটি এলাকায় আবার একই উৎস থেকে এসেছে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী এক ধরনের চরমজীবী *Methanopyrus*-এর পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর প্র-প্র পিতামহ হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। এর অর্থ একেবারেই পরিষ্কার। প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে পৃথিবীর সকল জীবই একে অন্যের আত্মীয়!

প্রাণের প্রকৃতি

আমরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে কিংবা ইটির মত চলচিত্রে কিন্তুতকিমাকার মহাজাগতিক প্রাণীদের বর্ণনা পাই যারা আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীটা আক্রমণ করার জন্য

মুখিয়ে আছে। তাদের থাকে সবুজ চামড়া, বিশাল বিশাল চোখ আর বড় বড় অ্যান্টেনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখক কিংবা চিত্রশিল্পীরা একেবারেই কল্পণার গডডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেন। এমন মনে করার আসলে কোনোই কারণ নেই অন্য কোন গ্রহের প্রাণ দেখতে হবে অনেকটা সরীসৃপ অথবা একটা কীটপতংগ অথবা মানুষের মতো; কিংবা তাদের ‘কসমেটিক এডজাস্টমেন্ট’ দিসেবে থাকবে সবুজ চামড়া, বিন্দুবৎ কান এবং এন্টেনা! বহির্জাগতিক প্রাণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কার্ল স্যাগান সঙ্গত কারণেই তাই বলতেন, ‘আমি কল্পবিজ্ঞানের ঐ ধরনের বহির্জাগতিক প্রাণীগুলোর আকার আকৃতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বেশিরভাগ গুলোর সাথেই একমত নই।’

পৃথিবীতে প্রাণের সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং অনন্যসাধারণ উপাদান হচ্ছে ডিএনএ অণু। কয়েক হাজার পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয় এক একটি ডিএনএ অণু। এই অণুর এক একটি অবিশ্বাস্যভাবে বিপুল সংখ্যক তথ্য বহন করে থাকে। ডিএনএ-র বৈচিত্রের কারণেই পৃথিবীতে উদ্ভব হয়েছে নানাবিধ প্রজাতির।

প্রশ্ন হচ্ছে, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও ডিএনএ-র অস্তিত্ব আছে কিনা। ডিএনএ অণু যেহেতু কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং আরো কিছু পরমাণু দিয়ে গঠিত, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও ডিএনএর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন বা ফসফরাসময় পরিবেশ মহাবিশ্বের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান। তবে এটাও সত্যি যে, ডিএনএ-র জটিল কাঠামো যা একে তথ্য বহনকারী হিসাবে তৈরি করেছে তা কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে সেটা বলা খুবই কঠিন। কাঁচামাল সহজলভ্য হলেও ডিএনএ-র উদ্ভব আচমকা এবং সৌভাগ্যপ্রসূত বিষয় বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে অনেকদিন ধরে।

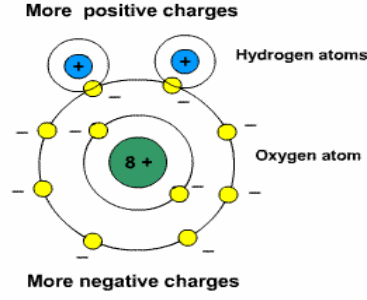
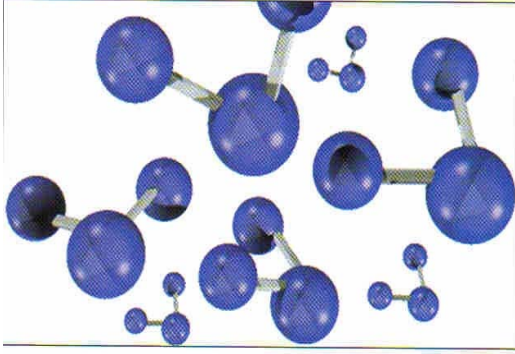
অবশ্য আরো একটি ভিন্ন ধরনের সম্ভাবনাও আছে। মহাবিশ্বের অন্য কোথাও হয়তো ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভিত্তিতে ভিন্নভাবে বিকাশ ঘটেছে প্রাণের। প্রাণ বলতে যদি এমন ব্যবস্থাকে বোঝানো হয় যার ভৌত ভিত্তি নির্ভর করে শক্তি সংগ্রহ, সঞ্চয় এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে কাজে লাগানো তাহলে এমনকি ‘অরাসায়নিক প্রাণের’ও সম্ভাবনা থাকতে পারে। এমনকি তা হতে পারে আয়োনাইজড গ্যাস কিংবা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করেও। আমাদের পার্থিব প্রাণের ভৌত ভিত্তি হল কার্বন পরমাণুর রসায়ন। এই কার্বন পরমাণু অসংখ্য বন্ধন তৈরি করেছে দুটো কারণে: আইসোমারিজম এবং ক্যাটিনেশন; ফলে গঠিত হতে পারে লম্বা, জটিল ও স্থায়ী শৃঙ্খল। কার্বনের পরিবর্তে অনেক বিজ্ঞানীই মহাজাগতিক প্রাণের ভিত্তি হিসাবে সিলিকনকে কল্পনা করেছেন। কার্বনের মতো সিলিকনও চারটি রাসায়নিক বন্ধন গঠন করতে পারে। যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রাণের ক্ষেত্রে যেমন জড়িত

রয়েছে কার্বনভিত্তিক অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া, ঠিক তেমনই একইভাবে কার্বনের মতো সিলিকনভিত্তিকও অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, পৃথিবীতে কার্বনের তুলনায় সিলিকন ১৩৫ গুণ বেশী পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এখানে সিলিকনভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেনি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, সিলিকনের বন্ধন কার্বনের মত এতটা শক্তিশালী নয়, এবং ডবল বন্ধনও অতোটা সহজে তৈরি হয় না। সিলিকন পরমাণুর আকার কার্বন পরমাণুর চেয়ে বড়। বৃহৎ এই আকৃতির কারণে সিলিকন কার্বনের মতো হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে না। যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ হাইড্রোজেন বন্ধনকে ব্যবহার করে থাকে সেগুলো সাধারণত কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী ও নমনীয় হয়ে থাকে। সমস্ত বিষয়ের বিবেচনায় অনেকের কাছেই কার্বন জীবন গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে বিবেচিত। এর ফলাফল হচ্ছে, আমাদের জীববিজ্ঞানীদের যাবতীয় গবেষণা অস্বস্তিকরভাবে ওই একই ধরনের ‘কার্বন ভিত্তিক’ জীববিজ্ঞানের কাগারে বন্দি।

সৌরজগতে প্রাণের সন্ধান

পৃথিবীর বাইরে এই সৌরজগতে আর যে দু’টো জায়গায় প্রাণ থাকার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন তার একটি হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ এবং অন্যটি বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা। বর্তমানে মঙ্গলের যে পরিবেশ তাতে করে সেখানে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। প্রতিদিনের গড় তাপমাত্রা ২২০ কেলভিনের উপর সচরাচরই উঠে যেটা পানির জমাটাকাঙ্কের চেয়েও ৫৩ কেলভিন নীচে। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রচুর তথ্য প্রমাণ রয়েছে যা থেকে ধারণা করা হয় যে মঙ্গলে একসময় তরল পানির অস্তিত্ব ছিল এবং বর্তমানেও সম্ভবত এর ভূ-গর্ভে পানি রয়ে গেছে।

পানির আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের কাছে সবসময়ই আকর্ষণীয়, কেননা পৃথিবীতে খুব সম্ভবত প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে পানিতে এবং প্রাণের টিকে থাকার জন্য পানির কোন বিকল্প নেই। পানি এমন একটি তাপমাত্রার সীমায় তরল অবস্থায় থাকে যেখানে প্রাণের অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হতে পারে। দুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত হয় পানির অণু। যেহেতু হাইড্রোজেন পরমাণু দু’টি অক্সিজেন পরমাণুর পুরোপুরি বিপরিত দিকে অবস্থান করে না, সে কারণে পানি মেরু অণু (Polar molecule) হিসাবে বিবেচিত অর্থাৎ এটি ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে সামান্য প্রভাবিত হয়। এ ছাড়া জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানগুলোর প্রায় সবই পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে। পানি ছাড়া অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়াই সম্ভব নয়।



চিত্র ৬.১ : পানির অণুর রাসায়নিক গঠন

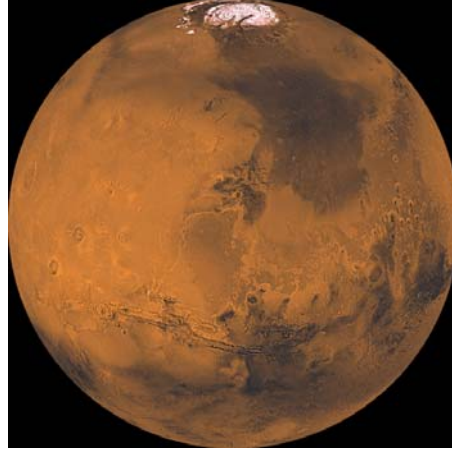
এছাড়া পানির আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটি এর হিমাক্ষের সামান্য উপরে কিছুটা প্রসারিত হয় অর্থাৎ পানি সবচেয়ে ভারি এবং এর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি চল্লিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ফলে বরফ যেহেতু পানির তুলনায় হালকা কাজেই অনায়াসে ভেসে থাকে পানির উপর। শীত আসার সঙ্গে সঙ্গেই কোন হ্রদের পানি যখন ক্রমান্বয়ে শীতল হতে শুরু করে তখন উপরের পানির ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং সেগুলো নীচের দিকে চলে যেতে থাকে। ফলে শুধুমাত্র উপরিভাগের পানিই বরফে পরিণত হয় এবং সেখানেই থেকে যায়। বরফ যদি লেকের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হতো তবে সেখানে কোন জলজ প্রাণীরই বেঁচে থাকা সম্ভবপর হতো না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে জীবনের সহায়ক হিসাবে পানির বিকল্পের কথাও চিন্তা করেছেন। তবে সেই সম্ভাবনার পরিমাণও খুবই কম। মাত্র তিনটি অণু আছে যাদের পানির যে সমস্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তার কিছু কিছু আছে। এরা হচ্ছে মিথেন, এমোনিয়া এবং হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড। এরা প্রত্যেকেই একটি বেশ বড় ধরনের তাপমাত্রার সীমায় তরল অবস্থায় থাকে। মহাবিশ্বে এদের পরিমাণও প্রচুর বা বলা যেতে পারে যে সমস্ত পরমাণু প্রয়োজন এগুলো তৈরি করার জন্য তা বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান। তবে এটা ঠিক যে পানির অণু গঠনের উপাদান হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের মতো এতো ব্যাপক পরিমাণে নেই। প্রত্যেকেই পানির মতো না হলেও মোটামুটি বেশ ব্যাপক পরিমাণ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে।

মঙ্গলের ওডিসি মিশনের (Odyssey) Thermal Emission Imaging System (THEMIS) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ছবি থেকে দেখা গেছে যে মঙ্গলের উপত্যকায় অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সম্বলিত নালা রয়েছে। এই ধরনের নালা পৃথিবীতে গঠিত হয়েছে শুধুমাত্র পানি প্রবাহের জন্য। মঙ্গলের পানি হয়তো বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এসেছে বা ভূ-গর্ভস্থ সঞ্চয় থেকেও আসতে পারে। যেখান থেকেই আসুক না কেন এই সমস্ত নালা গঠনের পেছনে পানি যে ভূমিকা

রেখেছে সেটা নিশ্চিত। উপত্যকার নালাসমূহের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা প্রমাণ করে যে এগুলো ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ একসময় মঙ্গলের পৃষ্ঠে পানির প্রবাহ ছিল।

যদিও মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের ইতিহাস অজানা, তারপরও ধারণা করা হয় যে, সাড়ে তিন বিলিয়ন থেকে চার বিলিয়ন বছর আগে বায়ুমন্ডল হয়তো আরো ঘন ছিল। ফলে শক্তিশালী গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণে মঙ্গল এখনকার তুলনায় অনেক বেশি উষ্ণ ছিল সেই সময়। ফলে মঙ্গলের পৃষ্ঠে পানি তরল আকারে থাকতে পেরেছে। সাড়ে তিন বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গলের ভূ-গর্ভে অনেক বেশি পরিমাণে পানি সঞ্চিত ছিল। মাঝে মাঝেই সেখান থেকে বন্যার আকারে পানি বের হয়ে এসেছে ভূ-পৃষ্ঠে, তৈরি করেছে জল নিষ্কাশনের অসংখ্য নালা। এই তথ্যের ভিত্তিতে এখনো মঙ্গলের পৃষ্ঠের কয়েক কিলোমিটার নিচে যেখানে তাপমাত্রা বরফের গলনাংকের চেয়ে বেশি সেখানে পানি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।



চিত্র ৬.২ : মঙ্গল গ্রহ।

মঙ্গল সবসময়ই শক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর। আগ্নেয়গিরিগুলো সেই আদিম সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উষ্ণতা যুগিয়ে চলেছে। এ ছাড়া জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শক্তি আসতে পারে আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রস্ফরক্স থেকে। ব্যাসাল্টের মধ্যে লোহার অক্সিডাইজেশন যে শক্তি নির্গত করে তাও প্রাণীরা ব্যবহার করতে পারে। জৈবিক পদার্থে অফুরন্ত উপস্থিতি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আর যা যা দরকার তার ঘাটতি পূরণ করেছে। পানি এবং শক্তির উপস্থিতি থাকার কারণে মঙ্গলে হয়তো আলাদাভাবেই জীবনের উদ্ভব ঘটেছিল।

দু'টো ভাইকিং রোবট স্পেসক্রাফট ১৯৭৬ সালে মঙ্গলের বুকে নেমেছিল। এদের ভিতরে ছিল ক্ষুদ্রাকার স্বয়ংক্রিয় রাসায়নিক এবং জীব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। এই রোবট স্পেসক্রাফট মঙ্গলের মাটির নমুনা সংগ্রহ করে এবং তাতে কোন ধরনের বিপাক ক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে কিনা দেখার চেষ্টা করে। পৃথিবীতে বিপাক কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভাইকিং এক্সপেরিমেন্ট মঙ্গলের মাটিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এই কার্বন ডাই অক্সাইড বিপাকের ফল নয় বরং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত মঙ্গলের ওই মাটি ভিন্ন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করেছে। এর অর্থ হচ্ছে খুব সম্ভবত মঙ্গলের মাটিতে বর্তমানে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

দূর অতীতে কি মঙ্গলের বুকে প্রাণ ছিল? এর উত্তর নির্ভর করছে কত দ্রুত জীবন উৎপন্ন হতে পারে তার উপর। জ্যোতির্বিদরা মোটামুটি নিশ্চিত যে প্লানেটসিমাল (planetesimals) এর পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে পৃথিবীর আদি অবস্থা প্রাণের জন্য পুরোপুরি বিরূপ ছিল। সেই সময় আমাদের এই ধরিত্রী ম্যাগমা বা গলিত পাথরের আচ্ছাদন দিয়ে আবৃত ছিল। ম্যাগমা শীতল হওয়ার পর যদি কোন প্রাণ থেকেও থাকে তবে সেগুলো মাঝে মাঝে বিশালাকৃতির যে সমস্ত প্লানেটসিমাল তখনও পৃথিবীতে আঘাত হানতো তাদের অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

চার বিলিয়ন বছর আগে এই ঝঞ্ঝা বিস্কন্ধ অবস্থায় স্থিতি আসে। প্রাপ্ত ফসিল থেকে দেখা যায় যে, ৩৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অণুজীব ছিল। প্রাথমিক ধরনের এই সরল প্রাণগুলো প্রাণ-রসায়নগতভাবে বেশ কার্যকর ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল সালাক সংশ্লেষী, ফলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে এগুলো। ম্যাক্স প্লান্ক ইনস্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রির (Max Planck Institute of Chemistry) ম্যানফ্রেড শিডলোস্কি (Manfred Schidlowski) আদিম পাথরের কার্বন আইসোটোপের অনুপাত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ৩৮০ কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে প্রাণের সমাহার ছিল। পৃথিবীতে প্রাণ বিকাশের এই দ্রুততা দেখে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রয়াত) খ্যাতনামা জ্যোতির্পদার্থবিদ কার্ল স্যাগান (Carl Sagan) যুক্তি দিয়েছিলেন যে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ অনেকটা অবশ্যম্ভাবী ছিল; অর্থাৎ, পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেলে প্রাণের উৎপত্তি ও বিবর্তন একটি মহাজগতিক অবশ্যম্ভাবিতা (Cosmic Inevitability)। একই ধরনের মত প্রকাশ করেন নোবেল বিজয়ী প্রাণরসায়নবিদ খ্রীস্টান দ্য দুভে (Christian de Duve)ও। তিনি অনেকটা নিঃসংশয় হয়েই বলেন : ‘ জীবনের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী ... যেখানেই প্রাণ

সহায়ক পরিবেশ পাওয়া যাবে, যা আমাদের পৃথিবীতে প্রায় চারশ কোটি বছর আগে ছিল, সেখানেই প্রাণের বিকাশ ঘটেবে' (Crawford, 2002)।

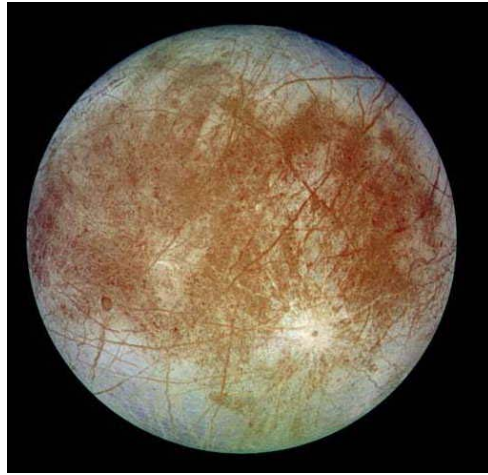
চারশ কোটি থেকে তিনশ আশি কোটি বছর আগে মঙ্গলের পরিবেশও পৃথিবীর মতোই প্রাণ উদ্ভবের সহায়ক ছিল। মঙ্গলের পৃষ্ঠে প্রাচীন নদী, লেক এমনকি ১০০ মিটার গভীরতার সাগরেরও চিহ্ন রয়ে গেছে। চারশ কোটি বছর আগে মঙ্গল এখনকার তুলনায় অনেক বেশি উষ্ণ এবং সিক্ত ছিল। এই সমস্ত তথ্য ধারণা দেয় যে, প্রাচীন পৃথিবীর মতো প্রাচীন মঙ্গলেও প্রাণের বিকাশ ঘটে থাকা সম্ভব। যদি তাই হয়ে থাকে তবে মঙ্গল বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থা থেকে বন্ধুর পরিবেশের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে প্রাণও হয়তো সর্বশেষ আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছে মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ তাপের ফলে স্থায়ী বরফের নিচের বিগলিত লবণাক্ত হুদে বা সিক্ত স্থানগুলোতে। বেশিরভাগ প্লানেটারি বিজ্ঞানী মনে করেন যে, ভবিষ্যত মঙ্গল অভিযানে আদিম প্রাণের রাসায়নিক বা অঙ্গসংস্থানিক জীবাশ্ম খুঁজে বের করা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

বর্তমানে এটা পরিষ্কার যে, সৌরজগত এবং এর বাইরে সর্বত্রই জৈব রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব বিদ্যমান। মঙ্গলের ছোট উপগ্রহ ফোবোস (Fobos) এবং ডেইমোস (Deimos)-এর গাঢ় রং দেখে ধারণা করা হয় যে, এই দু'টি উপগ্রহ জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি বা নিদেনপক্ষে জৈব পদার্থের আস্তরণ দিয়ে আচ্ছাদিত। অনেকেরই ধারণা যে এরা সৌরজগতের দূরবর্তী প্রান্তের গ্রহাণু (Asteroid) যা আটকে পড়েছে মঙ্গলের কক্ষে। জৈব পদার্থ দিয়ে আচ্ছাদিত এই রকম ছোট ছোট গ্রহাণু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সৌরজগতের বিভিন্ন জায়গায়। বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের মধ্যবর্তী প্রধান গ্রহাণুপুঞ্জ বেল্টের (Asteroids Belt) C এবং D ধরনের গ্রহাণুগুলি, ধুমকেতুর কেন্দ্র যেমন হ্যালির ধুমকেতু এবং সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত সৌরজগতের দূরবর্তী প্রান্তের একগুচ্ছ গ্রহাণুও রয়েছে। ১৯৮৬ সালে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির নভোযান Giotto হ্যালির ধুমকেতুর চারপাশের ধূলের মেঘের মধ্য দিয়ে সরাসরি উড়ে যায়। Giotto-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হ্যালির ধুমকেতুর কেন্দ্র ২৫ শতাংশ জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

পৃথিবীতে প্রাপ্ত বহুল পরিমাণে Carbonaceous chondrite উল্কাপিণ্ডগুলো প্রধান গ্রহাণুপুঞ্জ বেল্টের C ধরনের গ্রহাণুদের অংশ বলে মনে করা হয়। Carbonaceous উল্কাপিণ্ডগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এরোম্যাটিক এবং অন্যান্য হাইড্রোকার্বন পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক এমিনো এসিড এবং নিউক্লিওটাইড বেসও খুঁজে পেয়েছেন।

ধারণা করা হয় যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে আঘাত করা উল্কাপিণ্ড এবং ধুমকেতুগুলো হয়তো প্রাচীন সময়ে প্রচুর পরিমাণে জৈব অণু বহন করে নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে। এদের মধ্যে কোন কোনটি হয়তো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশের সময় প্রচন্ড তাপকে উপেক্ষা করে অক্ষত থেকে গিয়েছিল এবং ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। একই ধরনের ঘটনা অন্য গ্রহেও ঘটতে পারে। উল্কা এবং ধুমকেতু পানিসহ অন্যান্য জৈবিক পদার্থ বয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই সব গ্রহে। ওই গ্রহগুলোতে পৃথিবীর মতো প্রাণ-পূর্ব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য যে বিপুল পরিমাণে পানি থাকতে হবে তা কিন্তু নয়। ছোট্ট একটু পানির পুকুর, বরফের আন্তরণের নিচের সামান্য কিছু পানিই কিন্তু প্রাণ বিকাশের জন্য যথেষ্ট।

উপগ্রহ ট্রাইটন, ক্যালিস্টো এবং টাইটানের আকার এবং রাসায়নিক গঠন এদেরকে প্রাণ সহায়ক উপগ্রহ হিসাবে বিজ্ঞানীদের কাছে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু যে উপগ্রহটি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে বৃহস্পতির তৃতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ ইউরোপা। মনুষ্যবিহীন রোবট স্পেসক্রাফট ইউরোপা এবং সৌরজগতের দূরবর্তী প্রান্তের প্রায় মোটামুটি সব উপগ্রহগুলিরই ছবি তুলেছে। পৃথিবীতে প্রেরিত এই সব ছবিতে উপগ্রহগুলোর অনেক খুঁটিনাটি প্রকাশ পেয়েছে। এই ছবিগুলো থেকে দেখা যায় যে প্রতিটি উপগ্রহেরই আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।



চিত্র ৬.৩ : ইউরোপা

ইউরোপার প্রথম ঝাপসা ছবি পাঠায় ভয়েজার মহাকাশযান ১৯৭৯ সালে। পরবর্তীতে গ্যালিলিও মিশন আরো নিখুঁত ছবি পাঠিয়েছে ইউরোপার। সাদা চাদরে মোড়া এই উপগ্রহের ছবিতে দেখা যায় যে অসংখ্য আঁকাবাঁকা রেখা এর সারা গা বেয়ে বিস্তৃত। ইউরোপার সাদা চাদর হচ্ছে বরফ, আর কিছু নয়। ইউরোপা প্রায় এক মাইল চওড়া বরফে আচ্ছাদিত। আঁকাবাঁকা রেখাগুলো হচ্ছে বিশালাকার হিমবাহগুলোর প্রান্তদেশের মিলন মেলায় উৎপন্ন

সুদীর্ঘ দেয়াল (Ridge)। হিমবাহগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে তৈরি করেছে বিশালাকার বরফের চুড়া।

২০০০ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার জোতির্বিদ মার্গারেট কিভেলসন (Margaret Kivelson) ঘোষণা করেন যে, মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান গ্যালিলিওর ম্যাগনেটিক সেন্সর বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপায় বরফের আস্তরণের নিচে জলীয় সাগরের প্রমাণ পেয়েছে। জলের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীদেরকে দারুণভাবে উৎসাহিত করে তোলে। কেননা পৃথিবীতে খুব সম্ভবত প্রাণের প্রথম উদ্ভব হয়েছে পানিতে এবং পানি ছাড়া প্রাণ টিকে থাকতে পারে না। যদিও প্রাণ আশ্চর্যজনকভাবে যে কোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তবুও পানি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করা খুবই কঠিন।

বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণের সামান্য হেরফেরই ইউরোপার উষ্ণতার মূল উৎস। ইউরোপার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত তাপ আছে যা পানিকে তরল অবস্থায় রাখতে সক্ষম। পৃথিবীর সাগরের তলদেশের মতই ইউরোপার জলীয় সাগরের নিচেও উষ্ণ খাদ থাকতে পারে।

সৌরজগতের আটটির মধ্যে সাতটি গ্রহেরই ঘন বায়ুমন্ডল রয়েছে। এই গ্যাসীয়মন্ডলও জীবনের অস্তিত্বের জন্য খুব ভাল জায়গা হতে পারে। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব রাসায়নিক উপাদানই যেমন কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাসীয়মন্ডলের অণুগুলোতে বিদ্যমান। পানির বাষ্প এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তরলগুলোও সেখানে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সূর্যের আলো উপর থেকে শক্তি জোগাতে পারে এবং সামান্য কিছু পরিমাণ তাপ আসতে পারে গ্রহগুলোর গলিত লাভা থেকে। বাতাসে চলাচলের মুক্ত স্বাধীনতা এবং ভেসে থাকার সামর্থ্যের কারণে এই পরিবেশের প্রাণীদের শক্ত কাঠামোরও প্রয়োজন নেই।

সূর্যের আলোকে ভেনাসের বায়ুমন্ডল ভেদ করে যেতে দেয়। ফলে উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশ এবং বায়ুমন্ডলের নিচের অংশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। গ্রীন হাউজ এফেক্টের কারণে পরবর্তীতে বায়ুমন্ডল সমপরিমাণ তাপকে মহাশূন্যে চলে যেতে বাধা দেয়। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণে ভেনাস মোটামুটি নরকের মতো উত্তপ্ত হয়ে আছে। এর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা প্রায় ৪৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা সীসাকেও গলিয়ে ফেলতে সক্ষম। বায়ুর চাপও ভয়ঙ্কর রকমের বেশি সেখানে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তুলনায় প্রায় নব্বই গুন বেশি। প্রচলিত তাপমাত্রার

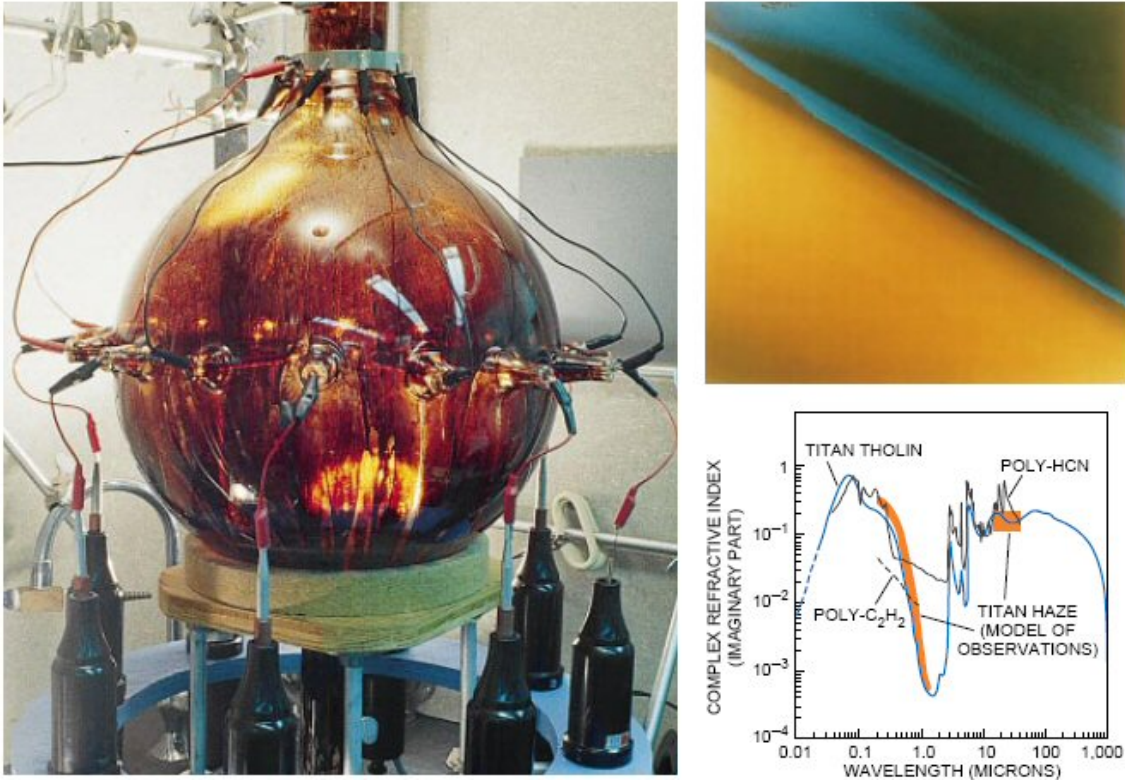
कारणे सेखाने बायु प्रवाहित हय २४० माइलेर बेशि गतिते। तीव्र उषःतार कारणे भू-पृष्ठेर काछाकाछि कोन वातासओ नेई बलते गेले।

কিন্তু ভেনাসের বায়ুমন্ডলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তিরিশ মাইল উপরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এখানকার তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। এর অবস্থান বায়ুমন্ডলের মাঝামাঝি পর্যায়ে। এই অবস্থাকে বলা হয় Goldilock effect. ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের জ্যোতির্বিদ ড্রিক শুলজ-মাকুচ (Drik Schulze-Makuch) বলেন যে ভেনাসের বায়ুমন্ডলে দৃশ্যমান তিনটি এসিডিক রাসায়নিক পদার্থ হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই অক্সাইড এবং কার্বনিল সালফাইড সেখানকার বাতাসে ভেসে থাকা অণুজীবের উপজাতও হতে পারে। পৃথিবীতে কিছু কিছু চরমজীবী যে পরিবেশে টিকে আছে এই পরিবেশ তার চেয়ে খুব একটা খারাপ কিছু নয়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলেও ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি রয়েছে যেগুলো ভেসে বেড়ায় এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে।

মঙ্গলের কক্ষপথের পর থেকে সূর্যের আলোর তীব্রতা কমে গেছে বেশ খানিকটা। এখান থেকেই বিশালাকৃতির গ্যাসীয় গ্রহগুলোর সূত্রপাত। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন এই চারটি গ্রহের কোনটিরই শক্তি ভূ-পৃষ্ঠ নেই। কিন্তু ভেনাসের মতোই এখানেও বায়ুমন্ডলের Goldilock effect এলাকায় জীবনের জন্য সহায়ক পরিবেশ রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ই ই স্যালপিটার (E.E. Salpeter) এবং কার্ল স্যাগান (Carl Sagan) প্রস্তাব দেন যে, পৃথিবীতে প্রথম বিলিয়ন বছরে যে প্রক্রিয়ায় প্রাণের বিকাশ হয়েছিল সেই একই রকমভাবে এই সমস্ত গ্যাসীয় দৈত্যাকার গ্রহের বায়ুমন্ডলেও প্রাণের বিকাশ ঘটে থাকতে পারে। ১৯৯৫ সালে গ্যালিলিও মহাকাশযান যখন বৃহস্পতির বায়ুমন্ডলে ঢুকেছিল তখন সেখানে কোন প্রাণের অস্তিত্ব উদঘাটন করতে পারেনি। এর আগের বছর ধুমকেতু শুমেখার লেভি যখন বৃহস্পতির উপর আছড়ে পড়ে তখনও কোন জৈবিক বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু বৃহস্পতির বায়ুমন্ডল এতাই সুবিশাল যে এক জায়গায় না পাওয়া গেলেও অন্য কোথাও জীবনের উপস্থিতির সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বৃহস্পতি অবশ্য আরো একটি কারণে বিজ্ঞানীদের আগ্রহের কেন্দ্রে থেকে যাচ্ছে। বৃহস্পতির মতো একই ধরনের গ্রহ মহাকাশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। সেই সমস্ত গ্রহের বায়ুমন্ডলের রাসায়নিক গঠন বৃহস্পতির বায়ুমন্ডলের মতোই জটিল হওয়ার কথা। এই ধরনের গ্রহ যত বেশি মহাবিশ্বে আবিষ্কৃত হবে তত বেশি সেই সমস্ত গ্রহে জীবন বিকাশের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হবে।

শনির দৈত্যাকৃতির উপগ্রহ টাইটানের (এটা প্রায় বুধ গ্রহের সমান আয়তনের) প্রাণ-পূর্ব জৈব রসায়ন বিজ্ঞানীদেরকে আগ্রহী করে তুলেছে এই উপগ্রহটির প্রতি। আমাদের চোখের সামনেই এখানে জটিল অণুর সংশ্লেষ ঘটে চলেছে প্রতিমুহুর্তে। প্রধানত নাইট্রোজেন অণু এবং সামান্য কিছু পরিমাণে (১০ শতাংশ) মিথেন সমন্বয়ে গঠিত টাইটানের বায়ুমন্ডল পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তুলনায় প্রায় দশগুণ বড়। ১৯৮১ সালে ভয়েজার-২ টাইটানের কাছাকাছি যাওয়া সত্ত্বেও এর চারপাশের লালচে গোলাপী অস্বচ্ছ কুয়াশার কারণে এর ভূ-পৃষ্ঠের হৃদিস পায়নি। টাইটানের ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা খুবই কম, মাত্র ৯৪ কেলভিন বা মাইনাস ১৭৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। টাইটানের স্বল্প ঘনত্ব এবং এর আশেপাশের গ্রহ উপগ্রহের সাথে তুলনা করে অনুমান করা যায় যে, এর ভূ-পৃষ্ঠ বা তার কাছাকাছি কোথাও বিপুল পরিমাণে বরফ রয়েছে। সেই সাথে সামান্য কিছু সংখ্যক সরল অণু যেমন হাইড্রোকার্বন এবং nitriles ও পাওয়া গেছে টাইটানের বায়ুমন্ডলে। সূর্যের অতি বেগুণী রশ্মি, শনির চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে আটকে পড়া আয়নিত অণু এবং কসমিক রশ্মি সব একসাথে টাইটানের বায়ুমন্ডলে ঝাপিয়ে পড়ে সেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটিয়েছে।



চিত্র ৬.৪ : টাইটানের নাইট্রোজেন-মিথেন বায়ুমন্ডলের ল্যাবরেটরী সিমুলেশন

কার্ল স্যাগান এবং তার সহকর্মী বিষ্ণু এন খারে (Bishun N. Khare) গবেষণাগারে কৃত্রিম ফ্লাস্কের মধ্যে টাইটানের বায়ুমন্ডল এবং এর চাপকে সিমুলেট করেন এবং এর মধ্য দিয়ে

বিদ্যুৎ ক্ষরণ ঘটান। এর ফলশ্রুতিতে গাঢ় বর্ণের ঘন কাদার মতো জৈবিক পদার্থ তৈরি হয়। তারা এর নামকরণ করেন টাইটান থোলিন (Titan Tholin)। এই টাইটান থোলিনের অপটিক্যাল কনস্ট্যান্ট পরিমাপ করে বিজ্ঞানীদ্বয় দেখেন যে এটা টাইটানের বায়ুমন্ডলের অপটিক্যাল কনস্ট্যান্টের সাথে হুবহু মিলে যায়।

টাইটানের বায়ুমন্ডলের উচ্চস্তরে প্রতি মুহূর্তেই তৈরি হচ্ছে জৈব অণু এবং তা ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে নতুন থোলিন তৈরি হওয়ার সাথে সাথে। গত চার মিলিয়ন বছর ধরে যদি এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে তবে টাইটানের পৃষ্ঠ কয়েকশ’ মিটার থোলিন এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ দিয়ে আবৃত হয়ে যাওয়ার কথা। স্যাগান এবং খেয়ার তাদের ল্যাবে তৈরি টাইটানের থোলিনের সাথে পানি মেশানোর ফলে এমিনো এসিডও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু এমিনো এসিডই নয়, এর মধ্যে ছিল নিউক্লিওটাইড বেজ, পলিসাইক্লিক এরোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন এবং আরো কিছু জৈব পদার্থের সমাহার।

অতি সম্প্রতি নাসার মহাকাশযান ক্যাসিনির (Cassini) পাঠানো রাডার ইমেজ টাইটানের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ জানাডুতে (Xanadu) পৃথিবীর মতো ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছে। এই রাডার ইমেজ থেকে দেখা যাচ্ছে যে জানাডুর পশ্চিম প্রান্তে গাঢ় বর্ণের বালিয়াড়ীর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য শাখা প্রশাখা সম্বলিত নদী, পাহাড় এবং উপত্যকা। এই নদীগুলো আরো কৃষ্ণ এলাকার দিকে চলে গেছে যাকে মনে করা হচ্ছে লেক বলে। এই ইমেজ থেকে গ্রহাণু আঘাত বা আগ্নেয়গিরির কারণে একটি জ্বালামুখও (Crater) দৃশ্যমান।

ক্যাসিনি ইন্টারপ্লানেটারি বিজ্ঞানী ডঃ জোনাথান লুনাইন (Dr. Jonathan Lunine) বলেন যে, ‘টাইটান পৃথিবী থেকে এতো দূরে যে পৃথিবীতে বা মহাকাশে অবস্থিত টেলিস্কোপের মাধ্যমে এর সব কিছু দৃশ্যমান ছিল না। ফলে আমাদেরকে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সব কিছুই অনুমান করে নিতে হয়েছে। কিন্তু এখন ক্যাসিনির শক্তিশালী রাডার চোখের কারণে আর আমাদেরকে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। আশ্চর্যজনক যে, পৃথিবী থেকে বহু দূরের এই উপগ্রহে পৃথিবীর মতোই ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।’

১৯৮৪ সালে নাসার হাবল স্পেস টেলিস্কোপ প্রথম টাইটানের জানাডু এলাকা আবিষ্কার করে। এ বছরের (২০০৬) এপ্রিল মাসে যখন ক্যাসিনির রাডার সিস্টেম জানাডুকে পর্যবেক্ষণ করে তখনই দেখা যায় যে, এর ভূ-পৃষ্ঠ বায়ু, বৃষ্টি এবং তরল পদার্থের কারণে পরিবর্তিত হয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাসিনির বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রোব হাইজেন্স (Huygens) অবতরণ করে টাইটানের পৃষ্ঠের কাদামাটিতে। পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে টাইটানে জলীয় পদার্থ রয়েছে। টাইটানের আবিষ্কারক ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইজেন্স (Christian Huygens) আজ বেঁচে থাকলে টাইটানে জলীয় পদার্থের উপস্থিতির ঘটনায় হয়তো খুব একটা অবাধ হতেন না। হাইজেন ১৬৫৫ সালে টাইটান আবিষ্কার করেন। তার সম্মানার্থেই ক্যাসিনির প্রোবের নামকরণ করা হয়েছে হাইজেন্স। এখন থেকে তিনশ' বছরেরও বেশি সময় আগে ১৬৯৮ সালে হাইজেন্স টাইটানে পানি থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে লিখেছিলেনঃ

"Since 'tis certain that Earth and Jupiter have their Water and Clouds, there is no reason why the other Planets should be without them. I can't say that they are exactly of the same nature with our Water; but that they should be liquid their use requires, as their beauty does that they be clear. This Water of ours, in Jupiter or Saturn, would be frozen up instantly by reason of the vast distance of the Sun. Every Planet therefore must have its own Waters of such a temper not liable to Frost."

তবে টাইটানে জলীয় পদার্থ পাওয়া গেলেও এটি সম্ভবত পানি নয়। মোটামুটি নিশ্চিত যে জলীয় এই পদার্থ হয় মিথেন না হয় ইথেন। হয়তো এই তরলই বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে জানাডুতে কিংবা ভূগর্ভস্থ ঝরনা থেকে নির্গত হয় তরল পদার্থ। মিথেনের নদী ধূলিকণা বহন করে করেই তৈরি করেছে জানাডুতে ওইসব বালিয়াড়ী।

আমাদের সৌরজগতের বাইরে আন্তর্নক্ষত্রিক মহাশূন্যের গ্যাস এবং ধূলিকণার মধ্যেও জৈবিক পদার্থ খুঁজে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন অণুদের ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে নির্গত এবং আত্মস্থ করা মাইক্রোওয়েভ বিশ্লেষণ করে জোতির্বিদরা চার ডজনেরও বেশি সরল ধরনের জৈবিক পদার্থ সনাক্ত করতে পেরেছেন। এদের মধ্যে কিছু কিছু জৈবিক পদার্থ যেমন হাইড্রোকার্বন, এমাইনস, এ্যালকোহল এবং নাইট্রাইলের $HC_{11}N$ এর মতো সোজা কার্বন শৃংখল রয়েছে।

অতি বেগুনি এবং মহাজাগতিক রশ্মিতে উন্মুক্ত আন্তর্নক্ষত্রিক ধূলিকণার জৈবিক পদার্থে প্রাণের উৎপত্তির আশা করাটা বোকামি। কেননা আমরা যে জীবনকে জানি তা গঠনের জন্য প্রয়োজন পানি আর পানি থাকার জন্য প্রয়োজন গ্রহ বা উপগ্রহ। জোতির্বিজ্ঞানীয় পর্যবেক্ষণ

দিন দিন এই ধারণার ভিত্তি গড়ে দিচ্ছে যে এই মহাবিশ্বে গ্রহজগৎ বিরাজ করাটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। বিস্ময়করভাবে খুব কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত বেশ কিছু সংখ্যক নব্য গঠিত নক্ষত্রের চারপাশে যে গ্যাসীয় ও ধূলিকণার বৃত্ত রয়েছে তা গ্রহজগত উদ্ভবের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান।

কানোগি ইনস্টিটিউটের জর্জ ডব্লিউ ওয়েদারিল (George W. Wetherill) একটি মডেল তৈরি করেছেন যার মাধ্যমে ঐ সমস্ত গ্যাসীয় ধূলিকণা থেকে উৎপন্ন গ্রহদের বিন্যাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। ইতোমধ্যে পেনসালভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির জেমস ক্যাস্টিং (James F. Casting) নক্ষত্র থেকে কত দূরত্বে থাকলে একটি গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠে তরল পানি থাকতে পারে তা হিসাব করে দেখিয়েছেন। এই দুই গবেষণাকে একত্রিত করলে দেখা যায় যে, সৌরজগতে নক্ষত্র থেকে একটি বা দু'টি গ্রহ কমপক্ষে এমন দূরত্বে থাকবে যেখানে তাদের পৃষ্ঠে পানি থাকা সম্ভবপর।

কার্ল স্যাগানের মতে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবীর মতো পানিসমৃদ্ধ অসংখ্য গ্রহ রয়েছে যেখানে বিপুল পরিমাণে জটিল জৈবিক পদার্থ বিদ্যমান। সূর্যের মতো নক্ষত্রকে পরিভ্রমণরত ওই সমস্ত গ্রহগুলোতে এমন পরিবেশ রয়েছে যেখানে বিলিয়ন বছরে প্রাণের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটা বিচিত্র কিছু নয়।

অক্টোবর ৯, ২০০৬

{ ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে) : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিতব্য }

[পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...](#)